Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 56 – 64
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

হরিবংশরায় বচ্চন ও তাঁর মধুশালা

ড. আমিনা খাতুন
বাংলা শাখা প্রধান, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়, উত্তর প্রদেশ
Email ID : aminaamu2223@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Madhushala, Khayyam's Rubaiyat, Chhayabad.

Abstract

Harivangshrai Bachchan (Professor of English literature at Allahabad University), one of the famous literary icon of Indian Literature, who was regarded as a highly respected poet in Hindi literature. At the beginning of 20th century, a literary revolution (Chhayavad movement) was started in Hindi literary world which was marked by use of romantic and sensible themes such as love, nature, individualism, humanitarianism and Harivangshrai Bachchan, was the pioneer of it. His extraordinary literary works added a new dimension in Hindi literature. Throughout his life, he wrote about 30 volumes of prose and poetry in Hindi, but he is mostly remembered for his famous Hindi poetry book 'Madhushala'. 'Madhushala' drives inspiration from Khayyam's Rubaiyat. At very young age, after reading Edward Fitz Gerald's English translation of Khayyam's Rubaiyat, he was highly influenced by Khayyam's philosophy. Twice in his life, he reflected the philosophical thought and ideology of Khayyam in such an extraordinary way (Madhushala and Khayyam ki Madhushala, a Hindi translation of Khayyam's Rubaiyat), that the sweetness and charm of which is eternal even after the passage of almost ninety years. His poetry is distinguished by a sense of life and playfulness that can be felt deeply by those who read it. This article is an attempt to know this famous renowned poet of modern Hindi Literature through his iconic work 'Madhushala'.

Discussion

বাড়ী ফেরার পথে ইউনিভার্সিটিতে লাগা একটা বইয়ের স্টলে আমি প্রথমবার হরিবংশরায় বচ্চনের 'মধুশালা' বইটি দেখেছিলাম। ওখান থেকেই হরিবংশরায় বচ্চনের লেখা দুটি বই আমি কিনি - 'খৈয়াম কি মধুশালা' ও 'মধুশালা'। আসলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শোনা বর্তমান শতাব্দীর মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বাবার লেখা 'মধুশালা'র আবৃত্তি অন্যান্য শ্রোতার মতো আমার মনেও এক গভীর আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি

হরিবংশরায় বচ্চন (২৭.১১.১৯০৭ – ১৮.০১.২০০৩) কেন দু - দুবার মধুশালা লিখেছিলেন বা তাঁর সাহিত্যভাবনায় খৈয়ামের অবস্থানই বা কোথায়, কি আছে এই 'মধুশালা'য়- তা জানতেই বই দুটি পড়তে শুরু করি। স্বল্প জ্ঞান নিয়ে মধুধালাকে যত পড়েছি মুগ্ধ হয়েছি। আসলে অগ্নিপথ, নির্মাণ, বাঙ্গাল কা কাব্য, সতরঙ্গিনী, খাদি কে ফুল, দো চট্টানে, নিশা নিমন্ত্রণ, মধুকলশ, 'আরতি অউর আঙ্গারে' প্রভৃতির মতো বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা যখন প্রথমবার ১৯৩৫ সালে মধুশালা প্রকাশ করেন তখন হিন্দী সাহিত্য যেন এক লাফে সমৃদ্ধির শিখর স্পর্শ করে, জনপ্রিয় কবিতার বিশাল তালিকায় মধুশালার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। এত বছর পরও হরিবংশরায় বচ্চন তাঁর 'মধুশালা'র জন্য সমান ভাবে সম্মানিত। বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীতকার মান্না দে প্রথমবার এই মধুশালা থেকে কিছু কবিতা (রুবাইয়ৎ) বেছে নিয়ে একটি এ্যালবাম তৈরী করেন, যার শুরুতে রয়েছে অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠে মধুশালার আবৃত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যের এত জনপ্রিয় এক লেখককে খুব কম লোকই জানেন। বাঙ্গালীদের প্রায় সকলেই তাঁর পুত্র অমিতাভ বচ্চনকে বেশী করে জানলেও, ভারতীয় সিনেমা জগতের এই অতি সম্মানীয় নক্ষত্রের (legend) প্রতিভার মূল আকর তাঁর বাবাকে কেউ তেমনভাবে চেনেন না। আমার প্রবন্ধটি আধুনিক ভারতীয় হিন্দী সাহিত্যের এক বিখ্যাত স্বনামধন্য অনুভবী কবিকে তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে জানার এক প্রচেষ্টামাত্র।

একটি অসাধারণ কথা প্রচলিত আছে, যদি তুমি এক জীবনে হাজার জীবনকে জানতে চাও, তাহলে পড়ো। আর এক জীবনে হাজার জীবন বাঁচতে চাও তাহলে লেখ। কিন্তু সব লেখাই সময়ের প্রবাহের সঙ্গে টিকিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখে না, অনিত্য এই পৃথিবীতে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলি হারিয়েও যায়। কিন্তু অনিত্যতার এই জগতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে কিছু লেখা অমরত্ব লাভ করে লেখকের লেখার অসাধারণত্বে অথবা পরবর্তী যুগের কোন মহান শিল্পী তাকে অমর করে তোলেন তার স্বকীয় শৈল্পিক মোহনীয় স্পর্শে তাতে নবজীবন নবরূপ প্রদান করে। আর এমনটিই আমরা দেখতে পাই প্রচলিত অনিত্যতার সমস্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে শৈল্পিক মাধুর্যের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দুই কালের দুই দেশের দুজন মহান ব্যক্তিত্ব- ওমর খৈয়াম ও হরিবংশ রায় বচ্চন- একজন মধ্যযুগের ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত দার্শনিক কবি, অন্যজন আধুনিক ভারতীয় হিন্দী সাহিত্যের স্বনামধন্য অনুভবী কবি। তাঁদের রচনা বিশ্বসাহিত্য জগতে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে একজন লেখার প্রসাদগুণে আর অন্যজন সেই লেখাকে নিজের মাঝে ধারণ করে তাকে স্বকীয় রূপে নতুন মহিমায় প্রকাশ করে। ভাবতে অবাক লাগে দুজনের আগমন দুই ভিন্ন সময়ে, তাঁরা ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন সাংস্কৃতিক মহল থেকে উঠে আসা ব্যক্তিত্ব, অথচ মরমী বাণীর অদৃশ্য এক ডোর তাঁদেরকে এমন এক হৃদয় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে যে তাঁরা যেন একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে গেছেন। ভাবনার সাযুজ্যে, লেখার দুঃসাহসিকতায়, শৈল্পিক প্রতিভায় তাঁরা হয়ে উঠেছেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ওমর খৈয়াম - বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভাধারী এক কবি, প্রকৃত নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম। একাদশ শতকের কোন এক সময় তিনি ইরানের উত্তর খোরাশানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে নিজের মেধার গুণে মধ্যযুগের এক শ্রেষ্ঠ গণিতিক, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকরূপে প্রাচ্যদেশ থেকে সারাবিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। বীজগণিতে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম মনীষা জামাকসারি তাঁকে 'বিশ্বদার্শনিক' বলে অভিহিত করেছেন। তবে শিক্ষক বা গণিতজ্ঞ হিসেবে নয় ইরান বা পারস্যের বাইরে সারা পৃথিবীতে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে তাঁর লেখা রুবাই (কবিতা) গুলি। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও সুরের জীবনে এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে রুবাইয়ৎ। মনে রাখতে হবে কবি ওমরের কবিতা কেবল ভাব ও ভাষার ফুলঝুরি বা কোন সাধারণ ভাগাবেগপূর্ণ রোমান্টিক কল্পনার কাব্যিক চিত্রণ ছিল না, এগুলি মূলত তাঁর জীবন কেন্দ্রিক দার্শনিক ভাবনার অসাধারণ অভিব্যক্তি। এটে ফুটে উঠেছে আজীবনের অভিজ্ঞতাজাত জীবন ও দর্শনের নানাবিধ গূঢ় তত্ত্ব। ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, অঙ্কের কঠিন তত্ত্বের সমাধান খুঁজতে খুঁজতে ওমরের

ক্লান্ত মন দুদন্ড শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেছে কবিতার নিরিড় আলিঙ্গনে। ভাবতে অবাক লাগে, একদা যা তাঁকে প্রচন্ড সমালোচনার সম্মুখীন করেছিল, আজ সেই রুবাইগুলি মুক্ত মনের পাঠকদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে বাধ্য করেছে। কবি হিসেবে খৈয়ামকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ষোড়শ শতকের দিকে এক ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট টমাস হাইড নামে এক ব্যক্তি, যিনি ফারসি ভাষায় রচিত ওমরের রুবাইগুলি ইউরোপের ইন্টেলেকচুয়াল মহলে জনপ্রিয়তা দান করেন। ওমরের রুবাইগুলির গভীর তাত্ত্বিকতাকে অনুভব করতে পেরে তারা যেন ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠেন।

এরপর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন কাব্যরসিক অনুবাদকদের নিষ্ঠাশীল প্রচেষ্টায় সারাবিশ্বে তাঁর জনপ্রিয়তা বিস্তৃতি লাভ করে, বিশেষ করে ১৮৫৯ সালে এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড (Edward Fitz Gerald) নামক এক ব্রিটিশ সাহিত্যিক প্রথম ওমর খৈয়ামের ৭৫টি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে একটি পুস্তিকা বের করেন, ব্যবসায়িক মানসিকতাধারী ব্রিটিশ সমাজ প্রথমবার আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ে, ফিটসজেরাল্ডের অনুবাদ 'Ruba'iya't of Omar Khayya'm' তাঁরা যেন সরাসরি তাঁদের হৃদয়ের কথা শুনতে পান। তাঁর অনুবাদ কর্মটি কবি হিসেবে খৈয়ামের খ্যাতি বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেয়, আর এভাবেই প্রায় হাজার বছর পেরিয়ে এসে ওমর ও তাঁর রুবাইগুলি নতুন ভাবে গবেষণার মূল বিষয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনকালে ফিটসজেরাল্ডের অনুবাদ ভারতে এসে পড়লে ভারতীয় সাহিত্যিকরাও খৈয়াম দ্বারা ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের বিভিন্ন কবি তাঁদের নিজের ভাষায় রুবাইগুলিকে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন। যেমন বাংলা সাহিত্যে কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রথম ফিটসজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদ থেকে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ের বাংলা অনুবাদ করে রুবাই অনুবাদের জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর নরেন্দ্র দেব তাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলেন। তবে ওমর খৈয়ামের সার্থক ও সুন্দরতম অনুবাদ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। এরপর সৈয়দ মুসতবা আলীসহ অনেকেই অনুবাদ করেছেন। তবে নজরুলের অনুবাদ সকলের থেকে স্বতন্ত্র, আর তার অন্যতম কারণ হল অনুবাদকদের প্রায় সকলেই ফিটসজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদ থেকে রুবাইগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু কাজী নজরুল ফারসি ভাষা জানতেন (তাঁর চাচা কাজী বজলে করিম ছিলেন মস্তবড় ফারসীবেত্তা, তাই পরিবারের মধ্যেও পেয়েছিলেন ফারসি চর্চার পরিবেশ, এমনকি শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে নজরুলের দ্বিতীয় ভাষা ছিল ফারসি, এছাড়া হাফিজ নুরন্নবী, পাঞ্জাবী মৌলানা সাহেব সবার অবদান তো রয়েছে তাঁর ফারসি ভাষা শিখতে) বলে ওমরের রুবাইয়তগুলি তিনি সরাসরি ফারসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। ফিটসজেরাল্ড ফারসি থেকে ওমরের রুবাইগুলি অনুবাদ করতে গিয়ে নিজের ইউরোপীয় মন ও মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে মানানসই অর্থ পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু নজরুল ওমরকে নিজের মাঝে অনুভব করে আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি অন্তর উৎসারিত চেতনাবোধ ও পরিশীলিত শব্দচয়ন ও ছন্দ বাক্যালংকারে বিভূষিত করে রুবাইগুলিকে অনুবাদ করেছিলেন বলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুবাদ এক অনন্যমাত্রা প্রদান করে।

সে যাইহোক, ফিটসজেরাল্ডের অনুবাদ পড়ে ওমরের দার্শনিক ভাবনা হিন্দী সাহিত্যের এক অল্প বয়সী তরুণ কবিকে এমন ভাবে তন্ময় করে তুলেছিল যে তিনি যেন জীবন ভোর ওমরের রুবাইয়ৎ-এর নেশায় আচ্ছন্ন থেকেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দুবার দুই রূপে এমন অসাধারণ ভাবে ওমর খৈয়ামের দার্শনিক ভাবনাকে ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন যার মাধুর্য, আকর্ষণ আজ প্রায় নব্বই বছর পেরিয়ে এসেও চিরঅম্লান। কবি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আচ্ছন্নতা প্রথমে পাঠকদের মাঝে ছড়িয়ে দেন তাঁর বিখ্যাত রচনা 'মধুশালা' ও 'খৈয়াম কি মধুশালা' গ্রন্থদুটির মধ্য দিয়ে। গ্রন্থদুটির মধ্য দিয়ে তিনি খৈয়ামের আধ্যত্মিক চেতনা তথা মানব জীবন আশ্রিত চির পুরাতন ও নতুন রহস্যজনিত নানা প্রশ্ন-উত্তর, তত্ত্বকথা তাঁর নিজস্ব ভাবনায় নবরূপে, নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করে এমন এক নতুন ওমরকে বিশ্বের সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন, যা সেই সময়ে বসে ওমরের অন্যান্য অনুরাগীও কল্পনাই করতে পারেন নি। আর এই তরুণ কবি হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, 'মধুশালা, মধুবালা ও মধুকলস'- জনপ্রিয়

কাব্যত্রয়ের রচয়িতা হরিবংশ রায় বচ্চন। হরিবংশরায়ের জন্ম ১৯০৭ সালের ২৭শে নভেম্বর ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আগ্রা ও আউধ সংযুক্ত প্রদেশের প্রতাপনগর জেলার বাপুপট্টি গ্রামে (যা বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত), বাবার নাম প্রতাপ নারায়ণ শ্রীবাস্তব ও মাতার নাম সরস্বতী দেবী শ্রীবাস্তব। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র হরিবংশ রায়ের সাহিত্যপ্রীতির সূত্রপাত পারিবারিক মহল থেকেই, খুব অল্প বয়সেই তাঁর কবি জীবনের শুরু। সময়ের সাথে সাথে নিজের লেখনী শৈলীর স্বকীয়তায় ছায়াবাদী কবি হিসেবে হিন্দী সাহিত্য জগতে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দী সাহিত্য জগতে আবেগধর্মী কবিতার আতিশয্যে এক শৈল্পিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, আর এই বিপ্লবের অন্যতম মুখ্যাধার ছিলেন হরিবংশরায় বচ্চন ও তাঁর অসাধারণ রচনা। তিনি সাধারণ মানুষের কথোপকথনের ভঙ্গিতে কবিতাকে প্রকাশ করে কবিতাকে সর্বজনবোধ্য করে তোলেন। তাঁর কবিতা নিমগ্নতা ও আধ্যাত্মিকতার জন্য বিখ্যাত। তিনি 'ভালবাসা'কে দূর্বলতা নয়, অবসাদ বিষণ্ণতা থেকে বেড়িয়ে আসার শক্তি রূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনা জীবনভারাক্রান্ত লোকদের মাঝে এক নতুন আশার দীপ জ্বেলে দিয়ে যায়। হরিবংশরায় নিজে কোনদিন মদিরা পান করেন নি, অথচ মধু, মদিরা, হালা(মদ), প্যালা (গ্লাস বা পেয়ালা), সাকী (মদিরা পরিবেশনকারী) আর মদিরালয় শব্দগুলিকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে জীবনের জটিলতাকে এমন অপরূপ ভাবে চিত্রণ করেছেন যেখানে সুফীবাদ মরমীবাদ সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'মধুশালা'-অর্থাৎ মদিরালয়। মদিরা যেমন মানুষদের কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়ে এক অনাবিল আনন্দে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক তেমনি হরিবংশরায় বচ্চনের 'মধুশালা' ওমর সৃষ্ট এক অপার লীলালাস্যে পরিপূর্ণ জীবনরহস্যের আগার, যেখানে প্রবেশ করলে আজও পাঠক এক অলৌকিক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পরেন।

হরিবংশরায়ের 'মধুশালা' নিয়ে আলোচনা করার আগে রুবাই নিয়ে কিছু কথা জেনে নেওয়া ভালো- খৈয়াম তাঁর ভাবনাগুলিকে ব্যক্ত করার জন্য এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেছিলেন সেটি হল রুবাই (ফারসি 'রুবাই' শব্দের বাংলা অর্থ কবিতা, এক বচনে রুবাই ও বহু বচনে রুবাইয়ৎ)-এর ফর্মে, মানে চৌপদী বা চতুষ্পদী অর্থাৎ চার চরণের মধ্যে একটিমাত্র ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করা। যে ভাবনাগুলো খৈয়ামের মনে দর্শন বা বিজ্ঞানের আওতায় তাৎক্ষণিক এসে ধরা দিত না সেগুলোকেই তিনি কবিতায় লিখে রাখতেন। এখন ওমর রুবাই-ই কেন লিখেছেন- আসলে ফারসি ভাষায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কবিতায় এক একটি নির্দিষ্ট ধরণ আছে। যদি দীর্ঘ প্রেম কাহিনী ধরনের কবিতা লিখতে চান তাহলে 'মাসনবি' (যেটা লিখে গেছেন মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি), প্রেম-বিরহ নিয়ে লিখলে 'গজল', কারো প্রসংশা করে লিখলে 'কাসিদা', আর দর্শন নিয়ে লিখলে 'রুবাই'। প্রেম, দ্রোহ, আনন্দ, বিষাদ, মানব হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের চিত্র অঙ্কিত হয় রুবায়তের ছত্রে ছত্রে। তাই খৈয়াম তাঁর জীবনলব্ধ দর্শনতত্ত্বকে প্রকাশ করার জন্য রুবাইকেই আধার বানিয়েছিলেন। রুবাই লেখার এক নির্দিষ্ট স্টাইল আছে- চার লাইনের ছোট্ট কবিতায় প্রথম দু লাইনে অন্ত্যমিল থাকবে, তৃতীয় লাইনের শেষে অন্ত্যমিল মুক্ত, আবার চতুর্থ লাইনে প্রথম দুই লাইনের মতো অন্ত্যমিল থাকবে। প্রথম দুলাইনে মূল বিষয়ের অবতারণা করা হবে, অন্তমিল সেই বিষয়ের ঐক্য ধারণ করবে, তৃতীয় লাইনে কবি বা দার্শনিক তাঁর সেই ভাবনা তুলে ধরবেন যা তিনি পদ্ধতিগত আলোচনা বা চর্চায় উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না, চতুর্থ লাইনে কবি উপরের লাইনে উদ্ধৃত সমস্যা সম্পর্কে নিজের কথা বলবেন। অনেকে রুবাইয়ের সঙ্গে চীনা চতুস্পদী কবিতা, জাপানি হাইকু প্রভৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়েছেন।

১৯৩৫ সালে 'মধুশালা' ও ১৯৩৮ সালে হরিবংশরায় বচ্চনের 'খৈয়াম কি মধুশালা' প্রকাশ পায়। মধুশালাকে নিয়ে আলোচনা করার আগে তাঁর 'খৈয়াম কি মধুশালা' গ্রন্থটি নিয়ে কিছু কথা বলব। হরিবংশরায় বচ্চনের আগেও হিন্দী সাহিত্যের অনেকেই ফিটসজেরাল্ডের অনুবাদ পড়ে ওমর খৈয়ামের রুবাইগুলির অনুবাদে প্রয়াসী হয়েছিলেন- যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-মজনু গোরখপুরী, ফিরাক গোরখপুরী প্রমুখ। তবে হরিবংশ রায় যে ভাবে ওমরকে

আত্মস্থ করে তাকে প্রকাশ করেছিলেন সকলের রচনায় সেই একাত্মতা খানিকটা দুর্বল, আর এখানেই তাঁর সৃষ্টির অনন্যতা। এই গ্রন্থে ফিটসজেরাল্ডের অনুদিত ৭৫টি রুবাইকে তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। রুবাইগুলির পাশাপাশি এই গ্রন্থের যে অংশটি আমাকে সব থেকে বেশি করে আকর্ষিত করেছে সেটি হল ভূমিকা অংশ। আমি সবাইকে গ্রন্থটির ভূমিকা অংশটিকে পড়বার অনুরোধ করব, এটিকে কেবল ভূমিকা হিসেবে ধরলে ভুল হবে, এটি মূলত এক কবির মননশীলতার পরিস্ফুটনের পাশাপাশি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস বললে ভুল হবে না যেখানে তিনি গদ্য ভাষাকে কবিতার গতিশীলতায় সমৃদ্ধ করে খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা বা আত্মিক সম্পর্কের সূচনার গল্প শুনিয়েছেন। 'খৈয়াম কি মধুশালা'র ভূমিকার শুরুতেই তিনি ওমর খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের গল্পটি খুব মজাদার ভাবে শুনিয়েছেন- তাঁদের বাড়িতে তাঁর পিতা প্রতাপ নারায়ণ শ্রীবাস্তব 'সরস্বতী' পত্রিকা নিয়ে আসতেন। তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন সেই ছোট্ট বয়সে 'সরস্বতী' পত্রিকায় প্রথমবার এক বুড়ো মুসলমানের এক রঙিন ছবি তিনি দেখতে পান, যার নীচে লেখা ছিল ওমর খৈয়াম, (তিনি সেদিন বুঝতেই পারেন নি 'সরস্বতী' পত্রিকায় প্রকাশিত ছবির সেই বুড়ো মুসলমান একদিন তাঁর ভাবাদর্শের নিয়ন্ত্রণ কর্তা হয়ে দাঁড়াবেন)। ছোটভাইয়ের জানতে চাওয়া একটা ছোট্টপ্রশ্ন -'ভাই, ওমর খৈয়াম ক্যা?'-এর উত্তরে নিজের অজ্ঞানে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার অর্থকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে তাঁকে অনেক সময় লেগেছিল- তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- ওমর খৈয়াম- অর্থাৎ উমর খতম, এখানে উমর (অর্থাৎ বয়স) খতম (শেষ) অর্থাৎ জীবন শেষ ভেবে বুড়ো আফসোস করছেন- আর এই ছোট্ট কথাটিকেই তিনি তরুণ বয়সে ওমরের রুবাই পড়তে গিয়ে ফিটসজেরাল্ডের অনুদিত ২৬ নং রুবাই-এ যেন নতুন ভাবে আবিষ্কার করেন- "Oh, Come with old Khayyam, and leave the wise / To talk: one thing is certain, that life flies"- খুঁজে পান জীবনের প্রকৃত অর্থকে নতুন ভাবে অনুভব করার এক রাস্তা- বাস্তবেই life flies-অর্থাৎ উমর বা বয়স (জীবন) শেষ হয়ে যায়- "One thing is certain, and the rest is lies; / The flower that has blown for ever dies". আর এভাবেই সময়ের স্রোতধারায় ওমর খৈয়ামের একান্তনুভূতি তাঁর মাঝে একাকার হয়ে যায় আর উদ্ভ্রান্ত এক সময়ে পথভ্রান্ত এক তরুণ কেবল খুঁজে পায় না জীবন রসে পরিপূর্ণ মধুশালাকে, অন্যদেরও এমন এক সরাইখানার সন্ধান দিয়ে যান যেখানে এসে মানুষের মন নির্মল, আত্মপ্রশান্তিতে ভরে ওঠে- 'মদিরালয় জানে কো ঘর সে চলতা হ্যায় পীনেবালা,/ কিস পথ সে জায়ুঁ, অসমঞ্জস মে হ্যায় ও ভোলাভালা,/ অলগ অলগ পথ বতলাতে সব পর ম্যায় ইয়ে বাতলাতা হুঁ-/ রাহ পাকাড় তু এক চলাচল, পা জায়েগা মধুশালা'।

১৩৫টি রুবাই নিয়ে হরিবংশরায়ের 'মধুশালা' প্রকাশিত হয়। মহাকবি সুমিত্রানন্দন পন্ত বলেছিলেন- 'মধুশালার মাদকতা চিরঅক্ষয়'। বাস্তবেই খুব সাদাসিধে ভাষায় ও শৈলীতে সহজ কল্পনাশীলতার মোড়কে জীবনের জটিলতত্ত্ব কে যে অসাধারণ রূপে তিনি চারটি পংতিতে ব্যক্ত করেছেন তা সত্যই প্রশংসারযোগ্য। 'মধুশালা'র বিশেষত্বই হল এটি কেবল মদ-সৌন্দর্যের কথা বলে না, বরং এটি জীবন সৌন্দর্য, তার তাৎপর্য, সার্থকতা এবং এর নশ্বরতা সম্পর্কে অনেক গূঢ় কথা বলে যায়। অতি পরিমিত শব্দ প্রয়োগ করে এমন এক মদিরালয় তিনি গড়ে তুলেছেন যেখানে শ্রোতারা (তাদের সকলের কবিতা সম্পর্কে তেমনকোন জ্ঞান না থাকলেও) এসে এক অলৌকিক চেতনার মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মধুশালার রুবাইয়াতের অর্থ বোঝার জন্য ভূমিকার অংশটি বারবার পড়তে হবে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন- ওমর খৈয়াম যে যুগে বসে বা যে পরিস্থিতিতে রুবাইগুলি রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে হরিবংশরায়ের যুগ ও পরিস্থিতি দুটোই সম্পূর্ণ আলাদা, তা সত্তেও তাঁদের মধ্যকার চিন্তার, রচনায় প্রতিফলিত চিত্র ও প্রতীক প্রভৃতির এত সাদৃশ্য কেন? মধুশালার ভূমিকাতে কবি নিজেই এর শৈল্পিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রতিটি সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনা, লেখনশৈলী প্রকাশের এক নিজস্ব বিশিষ্টতা রয়েছে। আর প্রতিটি সাহিত্যস্রষ্টা তাঁদের পূর্বসূরী চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা লেখকদের কাছ থেকে কিছুনা কিছু অনুপ্রেরণা নিয়ে থাকেন, বা পূরবর্তী ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। সময়ের

সাথে সেই ভাবনা তাঁদের লেখনশৈলীকে দৃঢ় করে তোলে, এবং তাঁদের সাহিত্য ভাবনায়, রচনার বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ওমর ও হরিবংশরায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আগেই বলেছি, ওমর খৈয়াম একাদশ শতাব্দীর একজন পারস্য পণ্ডিত যিনি কেবল কবিই ছিলেন না, তার সঙ্গে একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীও ছিলেন। সারা জীবনে ওমর হাজারেরও বেশী রুবাই লিখেছেন, যাতে উঠে এসেছে আশাবাদ, মরমিবাদ, নিয়তিবাদ, সুফিবাদ, নৈরাশ্যবাদের মতো অজস্র দর্শনতত্ত্ব। ওমরের দার্শনিক মতবাদ নিয়ে দার্শনিক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। তাঁর রুবাইগুলি মূলত বিভিন্ন ভাবধারার বিচিত্র অভিব্যক্তি, জীবনের পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি তাঁর আদর্শকে বদলে নিয়েছেন। কখনও তিনি নৈরাশ্যবাদে বিবর্ণ, কখনও আশাবাদে ঝলমল, কখনও তিনি অদৃষ্টবাদে উৎকণ্ঠিত, কখনও তিনি অজ্ঞেয়বাদে বিব্রত, কোথাও তিনি ভক্তিবাদে উচ্ছ্বসিত, কোথাওবা তিনি তপস্যাবাদে মন্ত্রণামুখর, কোথাও বা অতি স্পষ্টবাদী, আবার কোথাও ব্যঙ্গ পরিহাসপ্রিয়তায় লঘুপক্ষ। আসলে ওমরকে, তাঁর মতাদর্শকে জানা ভীষণ দুষ্কর। তাঁর কবিতায় পার্থিব জীবনের প্রতি হতাসা দেখে অনেকেই তাঁকে এপিকিউরিয়ান বলে মনে করেছেন, কারণ এপিকিউরিয় দর্শনেও মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশের কথা বিশ্বাস করায় জীবনকে মৃত্যুভয়হীন হয়ে ভোগের কথা বলা হয়ে থাকে- 'জীবন সংক্ষিপ্ত, তাই ভোগই জীবনের পরম ও একমাত্র লক্ষ্য'। এই দর্শনের পাশাপাশি অনেকে চার্বাক দর্শনের সঙ্গে খৈয়ামের মতাদর্শের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকেন, তবে এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে খৈয়াম জীবনকে ভোগ করার কথা বললেও উৎশৃঙ্খলতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেন নি, বা চার্বাকদের মতো 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'- মতবাদের সমর্থক ছিলেন না। আসলে নিজের সুখের জন্য ওমর এতোটা স্বার্থপর হতে চান নি। নিজের সুখের জন্য পরকে কষ্ট দেওয়ার মতো সংকীর্ণমনা তিনি ছিলেন না- আর এখানেই এপিকিউরিয়ান আর চার্বাকদের সাথে তাঁর মূল পার্থক্য। শেষ বয়সে এসে তাঁর মতাদর্শ অনেকটা পাল্টে যায়, তিনি পরম আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। অনেকদিন নির্জনতায় কাটানোর ফলে তাঁর চিন্তাধারা অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। আর সেই নির্জন পরিবেশে অন্তরমুখীন চিন্তা সুফিবাদের মরমীবাদে পরিস্ফুট হবে তা সহজেই অনুমেয়। জে বি নিকোলাস মনে করতেন ওমর সুফীবাদের মরমীবাদে বিশ্বাসী। সরাইখানা, মদ, সাকি- সবকিছুই হল রূপক। নজরুলও বলেছিলেন- ইতিহাস থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে ওমর কখনও শরাব পান করেছিলেন কিনা, কারণ তিনি সমকালীন সময়ে এতো বিতর্কিত ছিলেন যে তাঁর লাম্পট্য জীবনের কথা বা মদ বা সুরা পান করার কথা তার সমালোচকের রচনায় কোন না কোনভাবে উঠে আসত, যার হদিস আজও পাওয়া যায় নি। তিনি সেসময়ের অত্যান্ত সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন, সমকালীন ধর্মগোঁড়া ব্যক্তিরাও তাঁকে সম্মান করতেন, আর সর্বসাধারণের সম্মান লাভ কোন সাধারণ বিষয় নয়। তিনি শরাব সাকির স্বপ্নই দেখেছেন কিন্তু ভোগ করেন নি, এই সব রূপকের আড়ালে ওমর মূলত মরমীবাদকেই তুলে ধরেছেন। আসলে সে সময়ে শরাব-সাকি-গোলাপ-বুলবুল – এসব বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায় পারস্যের কবিরা তা ভাবতেই পারতেন না। ওমরের অন্যতম গদ্য অনুবাদক জন পেইনও মনে করেন ওমরের আদর্শ মূলত সূফীবাদ ও উপনিষদের মতাদর্শের সমন্বয়মাত্র। জন পেইন বলেছেন - তৎকালীন পারস্যে প্রচলিত সুফীবাদ মরমীবাদের আবরণে বৈদিকসর্বেশ্বরবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। (রুবাইয়া-ই-ওমার খাইয়াম, অনুবাদক- সিকান্দার আবু জাফর, বাংলা একাডেমি, ১৯৭১, দ্বিতীয় প্রকাশ)। ওমরের রুবাইয়তে অজ্ঞেয়বাদ অত্যান্ত প্রখর, কারণ ওমর বৈজ্ঞানিক হওয়ায় সন্দেহবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। দর্শনে তিনি ছিলেন ইবনে সিনার সমকক্ষ, ইবনে সিনা তাঁকে মননে, দর্শনে, চিন্তাধারায় প্রভাবিত করেছিল খুব স্বাভাবিক ভাবেই। আসলে তাঁর বেশির ভাগ রুবাইয়তে উঠে আসা

মরমীবাদের উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বিগত নয়শো বছর ধরে প্রচলিত ফারসি সাহিত্যের মতাদর্শের প্রভাব বললে ভুল হয় না।

অন্যদিকে হরিবংশরায় মধুশালা লিখেছিলেন তাঁর যৌবনকালে। বলা যেতে পারে এটি ছিল তাঁর যৌবনচিন্তার অনন্য প্রকাশ। এক তরুণ জীবন তথা সমকালীন সমাজের হতাশাকে দূর করার জন্য এক ভিন্ন মধুশালায় শান্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। সারা জীবন নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন হরিবংশরায়, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, শোক, সন্তাপ, দারিদ্র, প্রেম- সব কিছু নানা রঙে রঞ্জিত করে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তবে খৈয়ামের কবিতা তাঁর সেই অনুভবে এক ভিন্ন স্তর নির্মাণ করেছিল। নিজেই জানিয়েছেন-

> "তদপশ্চাত আমার জীবনে যে ভীষণ তুফান তথা ভাবনা-চিতায় যে উথালি-পাথালি ঢেউ উঠলো তাতে আমাকে সেই মনঃস্থিতিতে এনে ফেললো যার দরুণ উমর খৈয়ামের রুবাইয়ৎ আমার প্রাণের ধ্বনি হয়ে উঠলো। একেকটি রুবাই যেন মনে হল আমার জন্য লেখা হয়েছে। ...আমি উপরে উল্লেখ করেছি যে ব্যক্তির জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে উমর খৈয়ামের চিন্তাধারার প্রতি স্বয়ং আকর্ষিত হয়ে পড়ে।"[১]

আমরা যদি এই দুজন কবির মেজাজ-মর্জি খেয়াল করি তাহলে দেখব, দুজনেই যার যার যুগের বিদ্রোহী ভৃগু। ভগবান ও সমাজের নিয়ম উল্টে দেওয়ার হিম্মত ছিল দুজনেরই। সামাজিক অনাচার-অনিচারের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই ছিল প্রখর ও অপ্রতিরোধ্য। ওমর লড়েছেন তাঁর সময়ের মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, হরিবংশরায় বচ্চনও তাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংস্কৃতবান সংকীর্ণমনা মোল্লা পুরুতদের সংকীর্ণবাদ ও জাতপাতের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ কবিতায় নজর কাড়ে। ধর্মের সংকীর্ণগণ্ডী মানতে পারেন নি বলেই কায়স্ত ছিলেন, পারিবারিক পদবি 'শ্রীবাস্তব'কে ত্যাগ করে গ্রহণ করেন নতুন পদবী 'বচ্চন'। 'বচ্চন' অর্থাৎ 'যে বেঁচে আছে, এ বেঁচে থাকার অর্থ কোন কিছু থেকে বেঁচে যাওয়া নয়, এর অর্থ যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বচ্চন শব্দটি কোন জাতি বা গোত্রকে ব্যক্ত করে না। অর্থাৎ হরিবংশরায় বচ্চন কোন ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, নিজের মানব পরিচয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। এতার বৈপ্লবিক চেতনার পরিস্ফুরণ।

এছাড়া সেসময় হরিবংশরায়ের আরেক বিরুদ্ধ শক্তি ছিল সমকালীন বিদেশী সরকার। ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব কোথাও না কোথাও তাঁকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তিও যুগিয়েছিল। আসলে মধুশালা সৃষ্টির সময়টি ছিল খুব জটিল। গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন রাজনৈতিক স্তরে ব্যর্থ, গোপনে বেড়ে চলেছিল বিপ্লবী তৎপরতা, বেড়ে চলেছিল অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অরাজগতা, বেকারত্বের বোঝ, ক্ষুধা, অসাম্যের অপমান অগণিত বেকার যুবককে রাস্তায় নামিয়ে আনে, ফলে ব্রিটিশদের দমন-পীড়ন নীতি ভয়াবহ রূপ লাভ করে, সমগ্র ভারতীয় সমাজ হতাশার বেড়া জালে যেন আবদ্ধ- এমনই এক অশান্ত সময়ে এই তরুণ কবি জীবনের সমস্ত বিষন্নতাকে কাটিয়ে উঠত ওমরের দেখানো পথকে বেছে নেন। 'নব্যতরুণ দল মাথায় মৃত্যুর ফেট্টি বেঁধে নিজের প্রেয়সির কাছে গিয়ে বলল,

> "মানিনী আর বিলম্ব করা বৃথা, ...সম্ভবতঃ ইহা আমাদের অন্তিম মিলন'। দেশের ডাক তার কাছে তীব্রতর হয়ে চলেছে, তার কাছে হৃদয়ের ডাক শোনার সময় নেই। তরুণ-তরুণী ও ছোট্ট শিশুদের দল বানর সেনা গঠন করে বেরিয়ে পড়লো। ...এমনই ছিল সেই সব নিরাশাবৃত / নৈরাজ্যপূর্ণ সময় আর এমনই ছিল সেই শোকজনক পরিস্থিতি যার মধ্যে দেশের কোণা কোণা থেকে ওমর খৈয়ামের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।"[২]

আর তাই ওমরের মতো সারাজীবন এক ফোঁটা মদ না স্পর্শ করেও অলৌকিক মদকতাকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন অগণিত জনসাধারণের মাঝে যাতে তারা সমস্ত নিরাশাকে কাটিয়ে আবার নিজেকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র খুঁজে নিতে

পারে। খৈয়ামের মধুশালা যেখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ঘিরে হতাশা দেয়, হরিবংশরায়ের মধুশালা জীবনে প্রশান্তি আনে, উৎসাহ দেয়, ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জীবনের মতো করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায় আর এখানেই ওমরের মধুশালার সঙ্গে হরিবংশরায়ের মধুশালার মূল পার্থক্য।

> "এ বিশ্ব তোমার বিষময় জীবনে /এনে দিতে পারবে হালা, / যদি ক্ষণিকের জন্য হলেও ইহা আমার / মদমত্ত সাকীবালা, / শূন্য তোমার সময় যন্ত্রী কিছু যদি / গুঞ্জরিত করতে সে পারে, / জন্ম সফল তাঁর জানবে এ / জগতে আমার মধুশালা।"[৩]

গভীর আবেগ, স্পর্শকাতর অনুভূতিকে সহজবোধ্য সাবলীল ভাষায় কৃত্রিমতা দূর করে জীবনের প্রকৃতির চেনা উপমায় সাজিয়ে পাঠকদের যে মধুচক্র উপহার দিয়েছেন তা আজও তারা 'আনন্দে করে পান সুরা নিরবধি'। হরিবংশ রায় বচ্চন সময়ের ধুলো সরিয়ে মধ্যযুগীয় এই কবির রচনাকে ভারতীয় আধুনিক সাহিত্যে প্রথমে অনুবাদ ও পরে স্বকল্পনায় সজ্জিত করে এমনভাবে নবজীবন প্রদান করেছেন যে আমাদের মন আপ্লুত হয়ে ওঠে, মুগ্ধতায় ভোরে যায়, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তাঁর অনুবাদিত ওমর খৈয়ামের কবিতা, তাঁর 'মধুশালা' সেই একই সৌন্দর্যে সকলের চিত্তকে মোহিত করে চলেছে, মহাযুদ্ধ ক্লান্ত, জীবনের নানা জটিলতায় বিপর্যস্ত, অবিশ্বাসী মনে এযেন প্রশান্তির এক সজীব নিঃশ্বাস। অনেক সমালোচক বচ্চনের কবিতায় মদ, সাকী প্রভৃতির ব্যবহার দেখে অনেক সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বচ্চনের 'মদ' বস্তুবাদী অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এটি এমন এক মহৎ ঔষধ যা সকল রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। আসলে সামাজিক জীব হয়েও কবি বা সাহিত্যিক সাধারণ নন, কবির হৃদয় দূরদর্শী, তাঁর রচনা আগামী প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যৎ বাণী। তাঁর জ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে সূর্যের আলোক, তাঁর সাহিত্য মানবতার মুক্তির অনাবিল প্রয়াস। বর্তমান সময়ে ধর্মান্ধ পথভ্রষ্ট ভারতবাসীর সামনে হরিবংশরায়ের মধুশালার আলোচনা একান্তভাবে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আসলে বচ্চনের মধুশালা ধর্মের মিথ্যে শৃঙ্খলকে মুছে ফেলে সব মানুষকে একাকার করে দেবার মন্ত্র যোগায়-

> "ধর্ম-গ্রন্থ সব জ্বলা চুকি হ্যায়
> জিসকে অন্তর কী জ্বলা
> মন্দির, মসজিদ, গিরজে- সবকো
> তোড় চুকা জো মতবালা,
> পণ্ডিত, মোমিন, পাদ্রীয়ও কে
> ফন্দে কো জো কাট চুকা
> কর সকতি হ্যায় আজ উসি কা
> স্বাগত মেরি মধুশালা।"[৪]

তাই শেষে মধুশালার পুনর্নির্মাণ হোক এই আশা রেখেই বলব-

> "মুসলমান এক হিন্দু দুই, / কিন্তু এক তাদের পেয়ালা, / একই সেই তাদের মদিরালয়, / একই হয় যে তাদের হালা, / দোহে মিলে থাকে এক-দুজনা, / যায়না যখন মসজিদে-মন্দিরে, / বৈরিতার মূলেই মসজিদ-মন্দির/ মিলনের এই মহামেলা মধুশালা।"[৫]

Reference :

১. রায়, অরুণকুমার, হরিবংশরায় বচ্চন মধুশালা, অনুবাদক, ২০২৩, পৃ. ৩৫
২. রায়, অরুণকুমার, হরিবংশরায় বচ্চন মধুশালা, অনুবাদক, ২০২৩, পৃ. ৩৬

৩. রায়, অরুণকুমার, হরিবংশরায় বচ্চন মধুশালা, অনুবাদক, রুবাই নং- ১৩৪, ২০২৩, পৃ. ১৩৬

৪. মধুশালা, হরিবংশরায় 'বচ্চন', রুবাই নং-১৭, ২০১৬, পৃ. ৩০

৫. রায়, অরুণকুমার, হরিবংশরায় বচ্চন মধুশালা, অনুবাদক, রুবাই নং- ৫০, ২০২৩, পৃ. ৯৪

Bibliography :

সহায়ক গ্রন্থ :

মধুশালা, হরিবংশরায় 'বচ্চন', রাজপাল, সংস্করণ, ২০১৬, দিল্লী

'খৈয়াম কি মধুশালা', হরিবংশরায় 'বচ্চন', রাজপাল, সংস্করণ, ২০১৬, দিল্লী

হরিবংশরায় বচ্চন মধুশালা,আত্তীকরণ ও অনুবাদ- অরুণকুমার রায়, দে পাবলিকেশন্স, কলকাতা-৭৩, ২০২৩